গুরুদক্ষিণা

সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

১৯২২

মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ।

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্—এলাহাবাদ

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১এ, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্ত্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ

এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্তচিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের

কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সঙ্কোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র-মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া-দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয়, সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান্ বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুরষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে-ভাবে, যে-প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানপ্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক শুদ্ধশুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনকার্য্যকে যথার্থ ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন; অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়—ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম—তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল—"আমি বোলপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনাসম্পদ্ লাভ করিয়াছিল।

তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়—সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্য্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরি-সন্নিভ নির্ম্মল ঈশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরমকাঙালের রিক্তভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইত, তাহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্পবয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্ব্বলতা-অপূর্ণতা—সমস্ত দীনতার মধ্যে তাহার উৎসাহউদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে 'গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না, লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও আত্মনামঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা

খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়—তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কি ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর

বাহিরে, তেম্‌নি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে,—যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক, বা রুশ রাজা হউক্‌, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত;—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক; কে আমাদের ষ্টেট্‌সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়—কে কোন্ আইন করিল, এবং কে সে আইন্ উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণ-গুল্মে ও ঋতুপর্য্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের—জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা, এখানকার নিভৃতশান্তি ও সরল সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীরপ্রাঙ্গণে, গৃহকার্য্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

"জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও সয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা'

অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি সয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান ত নাই-ই, মাথা রাখিবারও স্থান প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্ব্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।"

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, "বর্ত্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।"

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না—ত্রিশকোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ্ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্ম্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হৌক, আমার সঙ্কল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক্ হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক্ হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট

নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল,—কোথায় সার্থক-ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠব্রহ্মচর্য্যের সৌম্যনির্ম্মলজ্যোতিঃপ্রভা ? তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও সে অহঙ্কার অনুভব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্রমধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমে চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ—এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খর্ব্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম দুই একটা কাঁটাগুল্ম, এবং উয়ের ঢিপিতে মিলিয়া একএকটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনভাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন

দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়িবিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহাগহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে—সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুরসহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্ত্তশব্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃণ্ময়কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্য্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্দ্ধদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার

উদ্‌ঘাটিত উন্মুখহৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণ-সাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "গুরুদক্ষিণা" নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তি-নিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে —ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল—ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়াও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্ল-নবীনহৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থের কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুত তাহা নহে। সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি, সেই অংশের পরিচয় এবং গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন "গুরুদক্ষিণা" পাঠ করিবেন, তখনই তাঁহারা এই গদ্যকাব্যটির

সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে, গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল, তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্ত্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল—সে সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে—সেগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য—অতএব সেই কথাকয়টি কেবল আমি রাখিলাম—তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ ও তাহার কবিতাটি এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল' নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মম্‌তাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল! অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি—ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়। পৃথিবীতে সকল সমাপনের মধ্যেই জরা এবং বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, সম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ক্ষুদ্র সসীমতারই প্রমাণ দিয়া থাকে। অতুল সৌন্দর্য্যসম্পদ্‌ও আমাদের কাছে মায়া বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ, আমরা তাহার বিকৃতি, তাহার শেষ দেখিতে পাই।

মম্‌তাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ

হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌষ্ঠবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবন ও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

পত্র।

ব্রহ্মবিদ্যালয়,
বোলপুর।

*   *   *   *

আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেখিয়াছি, তাজমহল দুটি ভাবে মনকে ক্ষুব্ধ করে। দিনের আলোকে, মলিন নরনারীর মধ্যে, ধূলা, শুষ্ক যমুনা, রেলের চীৎকার, ইংরাজের মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মবেগ রেলগাড়ির দৌড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ লীলার মধ্যে—তাজমহলটাকে বড়ই বাহুল্য বলিয়া মনে

হয়। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির রসে এই মর্ম্মরের রঙীন্ লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত সংসারের সঙ্গে সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কবরটি যেন একটা উচ্চ জমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Harmonious সৌষ্ঠব, ইহার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, ইহার বিরল চিত্রবিলাস—সমস্ত লইয়া যেন আমাদিগকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় পূজার ভাবে আচ্ছন্ন নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলায় তরঙ্গায়িত অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাসের ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে হয়, চারিদিক্ হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত লোক উঠাইয়া দিয়া একটি নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের ক্ষান্ত-উৎসার উৎসমুখগুলির রুদ্ধ শোকের প্রতি কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিষ্ঠুর ভাব। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে তাজের Perfect harmonyটি যখন মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাজকে আর নির্জীবভাবে পার্থিবভাবে দেখিবার জো নাই। তখন তাজকে বাহুল্যবর্জ্জিত একটি নিগূঢ় গীতের মত করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যখন দূরে আছি, তখন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছি।

*　　*　　*　　*

এই গেল আমার মনের কথাটা—এখন কবিতার সৌষ্ঠব কতদূর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিল্লী, আগ্রা, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া মনে আরও অনেক ভাব উঠিয়াছে—বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে যেন খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছি। * * *

বুদ্ধগয়ায় যখন অশোক-রেলিং দেখিলাম—রাঙা পাথরে যক্ষ আঁকা, যক্ষী আঁকা—বাড়ীটি গাছপালায় ঢাকা, নির্জ্জন—চারিদিকে স্তূপ—একজন জাপানী penitent জাপান হইতে প্রেরিত বুদ্ধের কাছে থাকে—তিব্বত হইতে, সিমলা হইতে গরীব-দুঃখী আসিয়া বাস করিতেছে—বর্ম্মা হইতে কতকগুলি ঘণ্টা উপহার পাঠাইয়াছে—তখন মনে হইল, ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে—কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এসিয়া-সুন্দরী সেখানে তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই।

কিন্তু বুদ্ধদেব আজ স্তম্ভিত। আপনি যে হিমালয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আজ—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" এই প্রচণ্ড করুণার উৎসটির স্তম্ভিত গাম্ভীর্য্যের নাড়া প্রাণে অনুভব করিয়াছি। অন্তকার পৃথিবীর সহিত মিল নাই; চতুর্দ্দিকে নূতন রাগিণী উঠিয়াছে—তাই বুদ্ধদেবও যেন ধরণীর বক্ষ-কোটরে প্রবেশ

করিয়াছেন। আপনি যে "মন্দির" লিখিয়াছেন—"রচিয়াছিনু দেউল একখানি"—তাহাতে আপনি এই বুদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন—বিশ্বের কর্ম্মের মধ্যে, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন—তাহা যেদিন হইবে, সেদিন সত্যসত্যই পৃথিবীতে নূতন আলো আবির্ভূত হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরূপেই বুঝিয়াছি। কারণ, উহার আগের পর্দ্দা হইতে যে গান উঠিতেছে, তার সুর শুনিয়া এবার আমাকে অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, যেন পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যসাধারণের হৃদয় একটি নারী এবং দিব্যসংবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যখন ভালবাসে, তখন নারী এক অপূর্ব্ব আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধদেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুখ নারীহৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল—কল্যাণকর্ম্মে উৎসব বিস্তার করিয়া, কলাকাণ্ডে মঙ্গলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লীলায় ক্রমে সেই আনন্দমিলনের উৎসব থামিয়া গেল। আজ যেন বুদ্ধগয়ার পাহাড়গুলির মধ্যে শুষ্ক নৈরঞ্জনা ও মাহীর তীরে ছায়াঢাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইয়া সেই নারী অন্ধের মত, অবচনার মত মন্দিরবক্ষকোটরে সেই পুরুষের ছবি লইয়া বসিয়া আছে। আজও তার অবসন্ন হস্ত বর্ম্মা এবং তিব্বত হইতে

সমাগত কাঙালীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান!" ফল্গুর মধ্যে যে অপরিচ্ছন্ন নরনারী কাপড় ধুইতেছে, তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কোনো যোগ আছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—কে যে সাহেব বিনা অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হুকুম করিতেছে, তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয়? তা ছাড়া, আমরা যে স্বচ্ছন্দমনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি, আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ? স্তম্ভিত প্রকাণ্ড পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি এবং অল্প একটুকুন্ অশোকের রেলিং এখনো যা বজায় আছে—তার আনন্দহিল্লোলিত ভক্তিভঙ্গি-সুন্দর ছবিগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় এইরকম একটা দুঃখের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে! এই স্তম্ভিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবসাদের মেঘ ঘনাইয়া আনে যে, চোখের জলে আর কিছুই দেখা যায় না—আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।

*   *   *   *   *   *

বোলপুর ১৩১১ সাল	}	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুখবন্ধ



হে কল্যাণীয় শিষ্যগণ, আজ সন্ধ্যায় তোমাদিকে অনেক দিন আগেকার একটি শিষ্যের অদ্ভুত গল্প শুনাইব, —তোমরা স্থির হইয়া বোস।

আমরা ঘরের মধ্যে এই যে দীপ জ্বালিয়াছি কিছুকালের জন্য এটা ভুলিয়া যাও। বাহিরে চারিদিকের মাঠের উপর, অনন্তআকাশের উপর যে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি হইতেছে তাই একবার ভাবিয়া দেখ। মাঠের কোনো প্রান্তে বনের রেখা এখন অস্পষ্ট, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ—উপমা দিয়া বলিতে পারি—যেন কোন প্রকাণ্ড অজগর সাপ এই নূতন বসন্তের আরম্ভ পৃথিবীর বিবর হইতে উঠিয়া মাঠের হাওয়ার মধ্যে, জ্যোৎস্নার মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

আজ রাত্রে আমরা একত্র হইয়া বসিয়াছি বলিয়া রাত্রির কথাই বলিলাম—দিন হইলে হয়তো দিনের কথাই বলিতাম। কিন্তু, না—রাত্রির বর্ণনা করার আরও উদ্দেশ্য আছে। রাত্রিই গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রকৃত সময়। রাত্রে সব অস্পষ্ট বলিয়া এই সময়ে অসম্ভবকে সম্ভব মনে হয়। অস্পষ্টতায় সমস্ত দূরের জিনিষ যেন কাছে আনিয়া দেয়। দিনের বেলায় তারা দেখিবার কথা তোমরা কি মনে ভাবিতে পারিতে? অথচ দেখ,—বাজিকরে কালো যষ্টিখানি টবের উপর বুলাইয়া লইলে যেমন টব ভরিয়া ফুল ফুটিয়া উঠে তেমনি রাত্রি তাহার ছায়া আকাশের উপর বুলাইয়া লইতেই আকাশ ভরিয়া কত শত তারা ফুটিয়া উঠিল।

তোমরা হয়ত গল্পের জন্য ইতিমধ্যে কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ, ভাবিতেছ গল্পের কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ভুলি নাই। এতক্ষণ রাত্রির বর্ণনা করিয়া তোমাদের মনকে আমি তারায়-চাঁদে শোভিত আকাশের মধ্যে, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বাহির করিয়া লইয়া গেছি। এখন কল্পনায় আমি যেদিকে

যাইব, তোমাদের মনও আমার পিছে পিছে সেই দিকেই যাইবে।

কোথায় যাই? যাইব পুরাতন ভারতবর্ষেরতপোবনের মধ্যে। দিনে হইলে ভারতবর্ষের মধ্যে তোমাদের মন কি কোথাও সেই শত শত বছর পূর্ব্বের তপোবনকে খুঁজিয়া পাইত? দিনে হইলে ভারতবর্ষে আজ কি দেখিতে পাইতাম? দেখিতাম, সহর, রেলগাড়ি, কলকারখানা, দেখিতাম হিংস্রজন্তুভরা বন, শুষ্ক নদী, শক্ত পাহাড়, পোড়া মরুভূমি—আরও হয়তো কত কিছু। সে তপোবন এখন আর নাই।

কিন্তু এখন রাত্রি——এখন জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে, ঘুমের নীরবতা আসিয়াছে—এখন মন উড়িয়া উড়িয়া গিয়া যেখানে যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিতে পারে। চল তবে আমরা সকল ভুলিয়া একবার সেই পুরাতন ভারতবর্ষের বনে ঋষির আশ্রম দেখিয়া আসি। তোমরা ব্রহ্মচারী, শিষ্য, তোমরা একবার সেকালের শিষ্যব্রহ্মচারীর চলাফেরা ভাবভঙ্গী দেখিয়া আসিবে এখন।

গুরুদক্ষিণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেকালের অনেক ছাত্রই অধ্যয়নের জন্য ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমে যাইত। আগেই বলিয়াছি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমগুলি তপোবনের মধ্যে স্থাপিত ছিল। ঋষিরা মনে করিতেন যেমন অনেক মানুষের একত্র হইয়া নানা কাণ্ড কারখানা করিয়া একেকটা সহর বাঁধিয়া তোলা আবশ্যক—তেমন আবার মানুষের আরও একটা প্রয়োজন আছে।

কেবল লোকালয়ের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকিলে কাজেকর্ম্মে গোলেমালে সমস্ত জগৎকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার সময় পাওয়া যায় না। মন শান্ত হয় না—শান্ত না হইলে সকল জিনিষের প্রকৃত অর্থ বোঝা, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা যায় না।

তা ছাড়া বনে থাকার আরও একটি উপকার ছিল

এই যে উহাতে মানুষ একটা স্বাধীনতা অনুভব করিত —নিজের মূল্যটাও বুঝিতে পারিত। নিজের কাজ-কর্ম্ম নিজেই করিতে হইত,—অমুক লোক গরিব অতএব ছোট, অমুক লোক ধনী অতএব বড়—এসব মিথ্যা জ্ঞান জন্মিতে পারিত না। এই সব তপোবনের ঋষিরাই বাস্তবিক ভারতবর্ষের শান্তি তখন রক্ষা করিতেন। এই সব তপোবনের নির্জ্জন স্থানে গুরুরা শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। সেই বনের সৌন্দর্য্যের মধ্যে, নির্জ্জনে শিক্ষা হইত বড় চমৎকার! তাই সেকালকার শিষ্যেরা পৃথিবীর এত সব আশ্চর্য্য মহিমা দেখিতে পাইত।

যে গল্পটি বলিতে যাইতেছি উহাতেই দেখিতে পাইবে এইরূপে নির্জ্জনে সেই ব্রহ্মচর্য্যের কি আশ্চর্য্য ফল একটি শিষ্য লাভ করিয়াছিল। এইবার গল্প আরম্ভ করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন তপোবনে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। এই আশ্রমের যিনি ঋষি তাঁহার নাম বেদ, তিনি ঋক্‌মন্ত্রে অগ্নিবন্দনা শেষ করিয়া সুস্নাত শুচি শিষ্যগণকে লইয়া

আমলকী গাছটির মূলে আসিয়া বসিয়াছেন—হরিণ-গুলি রাত্রে আঙিনায় এখানে সেখানে ঘুমাইয়াছিল, এখন উঠিয়া চারিদিকে বনে পালাইয়াছে। আশ্রমের গাভীকে একজন শিষ্য একটি কচি-ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরের উপর ছাড়িয়া দিয়া কাছেই কোন গাছের তলায় বসিয়া আছে—সবুজশীতল ডালপালার মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ বড় সুন্দর হইয়া তার মুখের উপর পড়িতেছে—ঋষি-বালক মৃদুমিষ্ট সুরে 'সবিতা' অর্থাৎ সূর্য্যের বন্দনাগান করিতেছে। একদল ছোট শিষ্য বনে প্রবেশ করিয়া ছোট ছোট সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছে। নিকটেই তাহাদের মা ঋষিপত্নী স্নান করিয়া আসিতে আসিতে প্রতিগাছের গোড়ায় আলবালে কলস হইতে একটু একটু জল ঢালিয়া দিতেছেন এবং সস্নেহ দৃষ্টিতে বালক-গুলির দিকে চাহিয়া মৃদুমৃদু হাসিছেন।

এইরূপে যখন প্রভাতের শান্তি চারিদিকে প্রসারিত, তখন আনন্দিত স্বরে বেদ ছাত্রগণের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

হে সৌম্য শিষ্যগণ, সে ব্রহ্মবিদ্যা কি—ধীরে ধীরে

তোমরাও তাহা জানিতেছ এবং জানিবে। ঈশ্বর করুন, যেন কাল প্রভাতে আমাদের হৃদয় মনও একবার সেই পুরাতন গুরুশিষ্যের মত শান্ত এবং স্নেহভক্তিপূর্ণ হইয়া যায়। গুরুশিষ্য আমরা সকলেই যেন বীর্য্যবান হই,—গুরুশিষ্য আমাদের উভয়েরই যেন মঙ্গল হয় এবং গুরুশিষ্য আমরা পরস্পর যেন কখনো অসরলতা প্রকাশ না করি। ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়ে ব্রহ্মের আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে।

গুরু বেদের আনন্দিত স্বর ও জ্যোতির্ম্ময় মুখচ্ছবি শিষ্যগণ মুগ্ধ হইয়া শুনিতে ও দেখিতে লাগিল এবং যখন সকালবেলায় অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল—তুটি একটি হরিণ সেই পড়ার স্থানে আসিয়া শিষ্যদের গায়ে কোমল মুখ লাগাইয়া গরম নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিল—তখন সকলেই এম্‌নি একটি আনন্দ বোধ করিতে লাগিল যে তাহা বলা যায় না। কোন কোন শিষ্য নিশ্চল স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

তখন একজন একটু বেশী বয়সের ছাত্র আসিয়া গুরুর পায়ে প্রণত হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল

"আজ আমার ব্রহ্মচর্য্যের কাল শেষ হইল। আপনার স্নেহে এবং শাসনে আমি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিয়াছি। মহাত্মন্, আমি বললাভ করিয়াছি। আমার শরীর তেজে পূর্ণ হইয়াছে, মন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং হৃদয়ে করুণা আবির্ভূত হইয়াছে। আমি চন্দ্রসূর্য্যের মহিমা দেখিতে পাইয়াছি। অগ্নির তেজ আমি অনুভব করিয়াছি। বৎসরের ছয় ঋতুর আনন্দের আমি আস্বাদন করিয়াছি। বনের শান্তি আমার প্রাণে তিষ্ঠিয়াছে এবং পশুপক্ষী তরুলতার জীবনচেষ্টার উৎসাহ আমার চিত্তকে গিয়া স্পর্শ করিয়াছে। তেজস্বিন্, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে অন্ন আমরা খাইয়া থাকি তাহা কল্যাণ করে বলিয়া আমাদের শ্রদ্ধার জিনিষ, যে গাছের কাঠে আমরা অগ্নি জ্বালাইয়া থাকি আমাদের কল্যাণ করে বলিয়া সেও আমাদের শ্রদ্ধার জিনিষ। বায়ু জল আকাশ এবং আলো সমস্তই কল্যাণের অমৃতে ভরিয়া রহিয়াছে—ইহারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার জিনিষ। আমরা মানুষ হইয়াছি, হৃদয় পাইয়াছি—সেই হৃদয় দিয়া যদি

সমস্ত জগতের এই কল্যাণের ভাবটি না অনুভব করিতে পারিলাম তবে আর কি হইল ? আমরা মানুষ হইয়াছি, বুদ্ধি পাইয়াছি, সেই বুদ্ধি দ্বারা যদি এই কল্যাণকে না বুঝিলাম এবং এই কল্যাণের সঙ্গে মিল রাখিয়া কাজ করিতে না পারিলাম তবে বুদ্ধিই বৃথা গেল। গুরুদেব আমি এ সমস্তই বুঝিয়াছি। এখন আমাকে মনুষ্য সমাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যেখানে আমার মত শত শত মানুষ রহিয়াছে, সেই গৃহস্থাশ্রমই জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থান। তরুলতা পশুপক্ষী আমাদের করুণা না হইলে বাঁচিতে পারে—ঈশ্বরই উহাদিগকে নানা উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন কিন্তু মানুষ তো মানুষের ভালবাসা না পাইলে বাঁচেনা—সেই জন্য গৃহস্থাশ্রমই প্রধান আশ্রম—সেইখানেই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কত দুঃখ সহিয়া, সুখে না মাতিয়া, কত ধীরভাবে পরের মঙ্গল করিয়া সেখানে থাকিতে হইবে—সেইখানেই আমাদের প্রধান পরীক্ষা। কিন্তু গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি—আমার কোন ভয় নাই—আমি সেখানে গিয়া মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে

পারিব। আমার শরীর দৃঢ় হইয়াছে—ক্লেশে ভয় পাইব না, আমার জিহ্বা মধুময় হইয়াছে—কাহাকেও কথা দ্বারা কষ্ট দিব না। আমার কান গভীর শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে—সকলের কথাই আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, এবং আমার হৃদয় শান্ত হইয়াছে—সকলকেই আমি ভালবাসিব। মহাত্মন্, আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম—কোটি কোটি প্রণাম—আপনিই আমার পিতা, —আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচের মত চিরদিন আমাকে ঘিরিয়া থাকিবে। গুরো, এখন আদেশ করুন আপনাকে কি দক্ষিণা আনিয়া দিব। দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইব।”

উতঙ্ক যখন এইরূপ নিবেদন করিতেছিলেন তখন শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া মুখ ম্লান করিল। উতঙ্ক চলিয়া যাইবে শুনিয়া তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—গুরুদেবও ছলছল চক্ষে, অথচ একটু হাসিয়া বলিলেন “বৎস উতঙ্ক, গুরুর হৃদয় সর্ব্বদা শিষ্যের সহিত থাকে, গুরুর আশীর্ব্বাদ মেঘে মিলিয়া বৃষ্টিরূপে শিষ্যের মাথায় পড়ে, সূর্য্যের আলোকে মিলিয়া শিষ্যের চক্ষে

আসিয়া লাগে, বায়ুজলরূপে শিষ্যকে প্রতিদিন স্পর্শ করে এবং শিষ্যের হৃদয়ের মধ্যে শান্তি এবং করুণা হইয়া চিরদিন বাস করে—আমার আশীর্ব্বাদ আর তোমাকে যাচিয়া লইতে হইবে না। বিশেষতঃ যে শিষ্যে গুরুর শিক্ষা সফল হয় সে শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ নিত্যধারা নদীর মত প্রবাহিত হয়। সৌম্য, তোমাতে আমার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে—তুমি গৃহাশ্রমে যাও—তোমার নিত্য মঙ্গল হউক্। দক্ষিণা আর আমি কি চাহিব বৎস, তোমার মা'র কাছে গিয়া বল—তাঁর প্রিয় কোন জিনিষ আনিয়া দিয়া গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হও।"

উতঙ্ক বলিল "গুরুদেব, গুরুর ঋণ হইতে কখনো কি কেউ মুক্ত হইতে পারে? তবে যাহা নিয়ম তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে—আচ্ছা, আমি মাতার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব।" এই বলিয়া গুরুর পায়ে লোটাইয়া প্রণাম করিয়া উতঙ্ক ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ছাত্রগণ দুঃখিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল—গুরুও

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন “বৎসগণ—এই বেলা তোমরা ভিক্ষায় যাও—সময় হইয়াছে।”

বালকগুলি গুরুকে প্রণাম করিয়া চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল—গ্রাম হইতে এই ভিক্ষা আসিবে তবে গুরুর ও ইহাদের আহার হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেক বড় বড় লোকের ছেলেরাও ছিল। কিন্তু সকলকেই ভিক্ষা করিতে হইত।

দেখ, নিয়মটি কেমন সুন্দর। ধনী বড়লোক পরকে দিয়া কাজ করাইয়া লয়, সুখে খাওয়া দাওয়া করে আর অলস অকর্ম্মণ্য জড়পদার্থ হইয়া যায়। নিজের সুখের জন্য পরকে দিয়া কাজ করাইলে কাজটাও করাইতে ইচ্ছা হয় খুব বেশী করিয়া। যাহাকে দিয়া নিজের কাজ করাইয়া লই তাহার সুখ দুঃখের কথা বড় একটা চিন্তা করি না, মনে করি সে যেন আমার কাজের জন্যই হইয়াছে। নিজে কাজ করিলেই আমরা কাজও অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বাড়াইয়া ফেলি না এবং কাজের গৌরবও বুঝিতে পারি। ইহা হইতে আবার যে অপর আমার কাজে সাহায্য করে তাহাকেও সম্মান করিতে এবং

ভালবাসিতে শিখি। এই জন্যই শিক্ষার সময়ে নিজের কাজ নিজে করিতে শেখা উচিত। তোমরা নিজ নিজ কাজ কর বলিয়াই কাজগুলিকে ঘৃণিত মনে কর না। ইহার ফল হইবে এই যে যখন বড় হইয়া দেখিবে তোমার চাকর তোমার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করিতেছে, তোমার তাঁতী গামছা বুনিয়া দিতেছে—তখন উহারা তোমারি কাজে তোমার সহায়তা করিতেছে এই মনে করিয়া উহাদিগকে সম্মান করিবে এবং ভালবাসিবে—যাহারা মূর্খ অলস বড়মানুষী চালে শিক্ষিত হইয়াছে—সেই অপদার্থগুলির মত উহাদিগকে ঘৃণা করিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুপত্নী তখন কুটীরের কাছে একটি অশোক গাছের ছায়ায় বসিয়া কুশ বুনিয়া আসন তৈয়ার করিতেছিলেন

—একটি গর্ভিনী হরিণী তাঁর কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চ সুরে টিট্রিভ পক্ষী "টিট্রিউ টিট্রিউ" এইরূপ শব্দ করিয়া কাছে কাছে উড়িয়া পড়িতেছিল। অশোক-গাছটির আলবালে কতকগুলি ছোট ছোট পাখী নিশ্চিন্তমনে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া জল খাইতেছিল। সেখানকার পশুপক্ষীর মুখের ভাব দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার নানা-রকম ইঙ্গিত জানে।

উতঙ্ক গুরুপত্নীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। উঠিয়া বলিতে লাগিলেন "মা আমার ব্রহ্ম-চর্য্যের কাল শেষ হইল। গুরুদেবের করুণায় আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি—আমি বললাভ করিয়াছি—এখন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে—জননি, কি দক্ষিণা দিব আদেশ করুন,—গুরুদেব আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন।"

গুরুপত্নী তাড়াতাড়ি আসন বোনা রাখিয়া দিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি চলিয়া যাইবে?" ঋষিপত্নীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ঋষিপত্নী বলিতে লাগিলেন "আচ্ছা, যাও বৎস, আশীর্ব্বাদ করি। একে একে কত পুত্র এইরূপে আমাকে স্নেহে বাঁধিয়া অবশেষে বন্ধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সেজন্য আমি দুঃখ করি না—তাহারা আশ্রমমধ্যে শ্রেষ্ঠ গৃহাশ্রমে গিয়া পৃথিবীর মঙ্গল কার্য্য করিতেছে! এই বনের মধ্যে চিরজীবন কাহাকে ধরিয়া রাখিব? কিন্তু, বৎস, আমার হৃদয়ের স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ চিরদিন তোমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন "সৌম্য, তোমাকে কি দক্ষিণা আনিতে বলিব? আমাদের কিসেরি বা অভাব? কিন্তু নিয়ম পালন না করিলেও ত নয়!" আবার কিছুকাল চুপ করিয়া কি যেন স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তেজস্বিন্, একটি কথা মনে পড়িল। রাজা পৌষ্যের শুভশুক্লা নামে রাণী জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই সতীকে দেবতারা অবধি বন্দনা করিয়া যায়। তপোবনের ঋষিগণ তাঁহার নাম গান করিয়া থাকেন। সেই সতীর উদার হৃদয়ের স্নেহ কঠিন পাথর পর্য্যন্ত অনুভব

করিয়া থাকে। অশুচি কোন লোক তাঁহার সম্মুখে গেলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহার সোনার কুণ্ডলদুটিকে স্বয়ং নাগরাজ তক্ষক পর্য্যন্ত তাঁহার রসাতলের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া গোপন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। আমার বড়ই ইচ্ছা হয় একবার সেই সতীর কুণ্ডলের স্পর্শ অনুভব করি। একবার সেই কুণ্ডল পরিয়া তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিয়া ভোজন করাই। আমার পূর্ণিমার ব্রত তাহা হইলেই সফল হইবে, কল্যাণে পূর্ণ হইবে। বৎস, তোমাদের কল্যাণের জন্যই ঐ ব্রত আমি আরম্ভ করিয়াছি। আর তিনদিন পরেই সেই ব্রত-নিমন্ত্রণ; বৎস, শুভ-শুক্লার কুণ্ডল পরিয়া আমি ঐ নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিব—তুমি ঐ কুণ্ডল আনিয়া দাও। তুমি ব্রহ্মচারী হইয়াছ—সেই সতীর কুণ্ডল তুমিই আনিতে পারিবে।"

উতঙ্ক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি-পত্নীর পায়ে নমস্কার করিয়া আনন্দে চলিয়া গেলেন—আজই দক্ষিণা আনিতে যাইবেন।

উতঙ্ক চলিয়া গেলে ঋষিপত্নী স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "বৎস উতঙ্ককে দক্ষিণা আনিতে পাঠাইলাম—একাকী কত দূরপথ যাইবে! কিন্তু তাহাতে কি ভয়? গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে তার পূর্ব্বে সতীর মহিমা একবার দেখিয়া লউক্। ব্রহ্মচারীর আবার কোথায় ভয়?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উতঙ্কের গভীর ভক্তি এবং নানাগুণের কথা ঋষিপত্নীর মনে পড়িতে লাগিল এবং যতই কেন মনকে প্রবোধ দিন্ না মন ব্যাকুল হইল—জননীর চোখ কেবলি জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল।

এই সময়ে অন্যান্য শিষ্যগণ ভিক্ষার চালডাল লইয়া ফিরিয়া আসিল—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অন্যদিনের মত আজ আর তাহারা গোলমাল করিতেছে না। ঋষিপত্নী বালকগুলিকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের দুঃখিতভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলেই কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল—"উতঙ্ক চলিয়া যাইবে!" তখন ঋষিপত্নী তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাহাদের সঙ্গে রান্নার দিকে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উতঙ্ক পৌষ্যরাজার বাড়ীতে যাত্রা করিয়াছেন। তপোবনের কাছের মাঠটি ছাড়াইয়া উতঙ্ক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন দুপুর—বনের বড় শোভা হইয়াছে—গাছের ছায়ার মধ্যে মধ্যে রৌদ্র পড়িয়াছে—বোধ হয় যেন সব রশ্মিরূপী চোর আলোরেখার মই বাহিয়া অন্ধকার বনের ফুল চুরি করিতে নামিয়া আসিতেছে। গাছের গুঁড়ির কোটরে কোটরে পাখী মুখ বাহির করিয়া আছে—রাঙা ঠোঁট কালো ঠোঁট দেখিয়া মনে হয় যেন গাছেরি রাঙা কালো পাতা বাহির হইয়াছে। কোথাও এক এক বনস্পতি প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপরে বড় বড় ডালপালার একেকটা গ্রাম ধরিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সারি-সারি তালগাছ কোথায় উঁচু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে—মাথায় মাথায়—পক্ষীর পাখনার মত পাতায় পাতায় মিলাইয়া কাঁধগুলির কাছে একটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও সাতসাতটি সুন্দর আঙুলের মত

পাতা ধরিয়া তক্‌তকে চারা ছাতিমগাছটি বনের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—বড় বড় লতা যেন গাছে গাছে পুল বাঁধিয়া দিয়াছে—কোথাও বা বন-দেবতাগণের খেলার জন্য যেন দোলা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। উতঙ্ক দেখিলেন এক একটা বরাহ মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে কোথায় যাইতেছে—কোথাও গর্ত্তের মধ্যে একেকটা শুইয়া পড়িয়া আছে। কখনো দেখিল দূরে গাছগাছড়ার আড়ালে প্রকাণ্ড দুটা বাঁকা শিং দেখা দিয়াছে, কখনো সাম্‌নে দিয়া হঠাৎ একটা বন্য হরিণ দৌড়াইয়া গেল। কখনো দেখিতে পাইল সম্মুখের একটি গাছের শাখায় বড় একটি মৌচাক—কালো পতঙ্গগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে উতঙ্ক একটি খোলা মাঠের উপর আসিয়া পড়িলেন। খরতর রৌদ্র দূরে যেন আগুনের শিখার মত ধূ ধূ কাঁপিতেছে; আকাশ ঘননীল। উতঙ্ক রৌদ্রের মধ্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে, সেই বনটির প্রান্তে ছায়ায় একবার বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোথাও কিছু নাই হঠাৎ মাঠের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড কালো বৃষ! কি আশ্চর্য্য! এ আসিল কোথা হইতে? এত বড় বৃষ পৃথিবীতে আছে বলিয়া তো উতঙ্ক জানিতেন না। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চক্ষু রগড়াইয়া লইলেন। রগড়াইয়া চোখ হইতে হাত সরাইয়া লইতেই—আরো আশ্চর্য্য! বৃষের পিঠে এক দীর্ঘাকার জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আরোহী হইয়া বসিয়া আছে। আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য হইয়া উতঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

তোমরা ভাবিতেছ উতঙ্ক এইবার ছুটিয়া পালাইবেন! কিন্তু তোমরা সেখানে থাকিলে তোমরাও নিশ্চয় তখন উতঙ্কের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে। ঐ যে বৃহৎ বৃষ—যাহার গলার কাছে ভাঁজে ভাঁজে পুষ্ট চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—কপালের উপরে দুটি দীর্ঘ তীক্ষ্ণ শিং চক্‌চক্ করিতেছে;—প্রত্যেক প্রকাণ্ড পায়ের গোড়া কিছুদূর অতি কোমল শাদা রোমে ঢাকা—প্রকাণ্ড পুচ্ছটি সুগোল, শ্বেতবর্ণ—ক্রমে সরু হইয়া প্রায় মাটি পর্য্যন্ত নামিয়াছে;—পিঠের

উপরে ককুদ নামক উচ্চ মাংসখণ্ডটি যেন তক্‌তক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে এবং কালো কপাল হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে ;—এবং ঐ যে তাহার উপরে খোলাগায়ে জ্যোতির্ম্ময় এক বলবান্‌ পুরুষ বসিয়া রহিয়াছে—উহাদের মধ্যে এম্‌নি একটি মনোহর শ্রী প্রকাশ পাইতেছিল যে তাহাই দেখিতে উতঙ্ক মুগ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

উতঙ্ক কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই দেখিলেন বৃষটি যেস্থানে ছিল সেখান হইতে না চলিয়াও যেন নিমেষের মধ্যে তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উতঙ্ক অত্যন্ত বিস্ময়ে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিলেন দুটি বড় কালো শীতল জ্বলজ্বল চক্ষু তাঁর দিকে আগে হইতেই চাহিয়া আছে। অতি শীতল জল পান করিলে শরীর যেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায় ঐ চোখদুটি দেখিয়া উতঙ্কের সর্ব্বশরীর সেইরূপ শান্ত শীতল হইয়া গেল ! কিন্তু একটু মুখ ঘুরাইতেই উতঙ্ক দেখিলেন তাহার উপরে আর একখানি অতি উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখে দুটি আনন্দিত চক্ষু তাঁর দিকে চাহিয়া আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই মুখের দিকে চাহিতেই উতঙ্ক স্বপ্নে শোনার মত শুনিলেন "বৎস এই বৃষভের গোময় ভক্ষণ কর, তোমার গুরুও পূর্ব্বে ইহা করিয়াছিলেন।"

উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সেই বৃষভের গোময় ভক্ষণ করিবার জন্য নত হইলেন। মুখে দিতেই উতঙ্কের অমৃতের মত বোধ হইল।

কিন্তু খাইয়া মাথা তুলিতেই দেখেন বৃষ কিম্বা আরোহী কোথাও কিছু নাই! বিস্ময়ে উতঙ্ক নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলেন গোময়ের চিহ্নও কিছুমাত্র নাই! মাঠ ভরিয়া রৌদ্র ধূ ধূ করিতেছে! নিকটে ছায়াময় নিবিড় বন, সেখান হইতে নানা পতঙ্গ পক্ষীর শব্দ শোনা যাইতেছে,—কাঠবিড়ালী তাহার ডোরা-আঁকা শরীরটি লইয়া বন হইতে এক একবার মাঠের দিকে ছুটিতেছে—থপ্ করিয়া থামিতেছে—একটু কিসের দিকে দৃষ্টি করিয়া আবার হঠাৎ বনে ফিরিয়া যাইতেছে।

উতঙ্কের মহা বিস্ময় লাগিয়া গেল। তিনি কহিলেন "তবে কি স্বপ্ন দেখিলাম! আমি কি বনের ছায়ায়

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ?—যাক্ যাক্—রাস্তায় বসিয়া স্বপ্ন দেখিলে ত চলিবে না। আমার যে দক্ষিণা আনিতে হইবে! পৌষ্যের বাড়ী এখনও কতদূর!"

ভাবিয়া উতঙ্ক দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তবু বারবার তাঁর মনে হইতে লাগিল "কি দেখিলাম ? কোন দেবতা আমাকে দেখা দিয়া গেলেন কি!" ভাবিতে ভাবিতে এক একবার তাঁহার চলিবার বেগ মন্দ হইয়া আসিল—আবার উতঙ্ক দক্ষিণার কথা মনে করিয়া দ্রুতবেগে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উতঙ্ক পৌষ্যের বাড়ী পৌঁছিতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উতঙ্ক ভাবিলেন রাত্রেই কুণ্ডল লইয়া ফিরিবার চেষ্টা করিব। তিনি দেরী না করিয়া সোজাসুজি পৌষ্যের কাছে গিয়া তাঁহার ইচ্ছাটা জানাইলেন।

পৌষ্য সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন "মহাত্মন্, হাত মুখ ধুইয়া আগে বিশ্রাম করুন—আপনি নিজেই অন্তঃপুরে গিয়া রাণীর কাছে আপনার যাহা চাহিবার চাহিয়া লইবেন—ব্যস্ত হইবার কি কারণ!"

উতঙ্ক বলিলেন "রাজন্, দীর্ঘায়ু হউন—আপনার কল্যাণ হৌক! আপনার উদারতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আজই কুণ্ডল লইয়া ফিরিতে পারিলে ভাল হইত! তাহা না হইলেও—আমি এখনই কুণ্ডল যাত্রা করিব মনে করিয়াছি। বাস্তবিক যতক্ষণে জননীর প্রিয় দক্ষিণা না সংগ্রহ করিতে পারি ততক্ষণ আমার চিত্ত শান্ত হইবে না।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন—প্রতিহারী এখনি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। মহাত্মন্, আমি এখন সন্ধ্যার কাজে নিযুক্ত হইব—আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

এই বলিয়া পৌষ্য উতঙ্কের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া

প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। উতঙ্ক আহ্লাদে দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রতিহারীর পিছে পিছে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকে রাজবাড়ীর কক্ষে কক্ষে দীপ সকল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অগ্নিগৃহে বেদীর উপর রাঙামুকুট পরিয়া অগ্নিদেব জাগিয়া বসিয়াছেন—আরতির ঘণ্টা বাজাইয়া পৌষ্য সেখানে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উতঙ্ক দেখিলেন উঠানে একটি বৃহৎ বকুলগাছ, তাহাতে অন্ধকার জমিয়া বসিয়াছে—চারিদিকে হর্ম্ম্যের জানালা হইতে আলো পড়িয়া তাহার পাতাগুলি দূর হইতে অত্যন্ত কালো এবং চক্‌চকে দেখাইতেছে। ঐ গাছটির মূলে একটি পুষ্ট গাভী দাঁড়াইয়া আছে। সুরভির শরীর পাটল কিন্তু সন্ধ্যায় কালো দেখাইতেছে—কপালের শ্বেত চন্দ্রকলাটি, পুচ্ছ ও ক্ষুরের কাছে শুভ্রতা গোধূলির মধ্যে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। সুরভির শরীরে কেমন একটি সুগন্ধ যেন লাগিয়া রহিয়াছে—আঘ্রাণে শরীরে

শান্তি বোধ হয়। সুরভির সম্মুখে লাল রঙের চেলী পরিয়া কয়েকটি কন্যা ধূপ দীপ লইয়া সুরভির সেবা করিতেছে।

একটি কক্ষে প্রতিহারী উতঙ্ককে বলিল "ব্রহ্মচারিণ্, আপনি এই কক্ষে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি মহারাণীকে ডাকিয়া লইয়া আসিব—ঐ কাছের কক্ষটিতে তিনি আপনাকে অভিবাদন করিবেন।" এই বলিয়া প্রতিহারী সেই সুরভি গাভীর দিকে চলিয়া গেল। উতঙ্ক কাছের কক্ষটিতে গিয়া বসিলেন।

বসিয়া বসিয়া উতঙ্ক দেখিতে লাগিলেন কি একটি মঙ্গলময় শোভায় চারিদিক শোভিত হইয়াছে! চারিদিকে কেমন একটি শান্তিময় গন্ধ! দেখিলেন রাণী শুভশুক্লার সখীগণ লাল চেলীর কাপড় পরিয়া দীপ হাতে করিয়া আঙিনার মধ্য দিয়া এদিক ওদিক আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাহাদেরি হাতের দীপের আলোকে তাহাদের সুন্দর মুখগুলি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! তাহাদের মুখে কি একটি আনন্দময় শান্তি-ময় ভাব!

অবশেষে প্রতিহারী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল। উতঙ্ক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের মধ্যে পরিষ্কার একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সুগন্ধ-তৈল পুড়িবার একটু মৃদু গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। চারিদিকে একটি লঘু ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে —কক্ষটির মধ্যে কোন জিনিষ-পত্র নাই—পরিষ্কার !

উতঙ্ক প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রতিহারী তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি শঙ্খ-নির্ম্মিত আসন দেখাইয়া দিলেন। তিনি বসিয়া প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনো কি রাণী আসেন নাই ? আমার বড়ই বিলম্ব হইতেছে !"

প্রতিহারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "ঐ যে শঙ্খ-নির্ম্মিত শুভ্র-আসনে রক্তবস্ত্র পরিয়া মা শুভশুক্লা বসিয়া আছেন, আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না ?"

উতঙ্ক বিশেষ দৃষ্টি করিয়াও কিছুই না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "প্রতিহারী, তুমি ও কি বলিতেছ ! তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ ? কোথায় রাণী বসিয়া আছেন ? আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"



কোথায় রাণী বসিয়া আছেন ? আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধা প্রতিহারী হাসিয়া কহিল, "ব্রহ্মচারী রাগ করিবেন না—আপনি বোধ হয় অশুচি আছেন, তাই সতীমাতা শুভশুক্লাকে দেখিতে পাইতেছেন না!"

ব্রহ্মচারী স্মরণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "তবে কি সেই স্বপ্ন প্রকৃতই স্বপ্ন নহে? সেই যে গোময় ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার পর আর আচমন করি নাই বলিয়া অশুচি আছি বটে, কিন্তু সে ব্যাপারটাকে যে স্বপ্ন মনে করিয়াছিলাম। কি আশ্চর্য্য! সতীর এ কি মহিমা!" শীঘ্রই উতঙ্ক আচমন করিয়া আসিলেন।

অনেক মহাযজ্ঞ যার তীরে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এমন সরস্বতীর পবিত্র-জলে হাতমুখ ধুইয়া, চক্ষু সেঁচিয়া, ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিতেই সতীর মহিমা তাঁহার নয়নগোচর হইল। সুবিশদ-শঙ্খনির্ম্মিত আসনে রাঙা চেলীর কাপড় পরিয়া সতী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখের এমনি একটি জ্যোতিঃ যে সোনার কুণ্ডল যেন মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার মুখে এমনি একটি হাস্য ফুটিয়া আছে যে কোন তারা, কোন ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়া তার সৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারি না।

শিশিরে চক্ষু ভিজাইয়া দিলে যেমন হয় উতঙ্কের চক্ষে সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উতঙ্ক চোখ না ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, এই সতী যেখানে বাস করে, সেই গৃহে দেবতারা নিত্য বাস করিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে শুভশুক্লা আসন হইতে নামিয়া আসিয়া উতঙ্ককে প্রণাম করিলেন। হাওয়ায় যেমন শালের ফুলমুকুল ঝরিয়া পড়ে, তেমনি উতঙ্কের হৃদয় হইতে যেন আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িল। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোমার নিত্য কল্যাণ হৌক, নিত্য কল্যাণ হৌক। মাতঃ, তোমাকে আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? আজ আমার ব্রহ্মচর্য্য সার্থক হইল—আজ আমি সতীর অলৌকিক মহিমা দেখিতে পাইলাম। মাতঃ, আমি তোমার উদার হস্তের একটি দান প্রার্থনা করিব, তোমার কুণ্ডল দুটি আমাকে দাও।"

সতী শুভশুক্লা একটিও কথা না বলিয়া, মৃদুমৃদু হাসিয়া, একটি সুমধুর ভঙ্গিতে ঘাড়টি এক এক দিকে বাঁকাইয়া, দুই হাতে এক এক কানের কুণ্ডল খুলিয়া

ফেলিলেন। রাণীর এক সখী একটি থালায় মধু, দধি, চন্দন, শুক্লধান এবং একটি বকুলপাতার গুচ্ছ সাজাইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। শুভশুক্লা সখীর হাত হইতে থাল লইয়া তাহাতে কুণ্ডল দুটি রাখিয়া দিলেন। এবং দু'হাতে থালাটি ধরিয়া উতঙ্কের পদতলে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। উতঙ্ক সেই মঙ্গল অর্ঘ গ্রহণ করিয়া কুণ্ডল দুটি তুলিয়া লইলেন। তখন সুমধুর-কণ্ঠে রাণী কহিলেন, "ব্রহ্মচারিণ্, সাবধানে এই কুণ্ডল রক্ষা করিবেন। নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলের প্রতি লোভ প্রকাশ করিয়াছেন।"

"তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া উতঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আনন্দে দুই হাত তুলিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সতীমাতঃ, তুমি চিরদিন গৃহ মঙ্গলে পূর্ণ করিয়া রাখ। সীমন্তিনি, তোমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিন শান্তির পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে—ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্যের মাধুর্য্যে তোমার অন্তর পরিপূর্ণ—হ্রী এবং শ্রী সর্ব্বদা অদৃশ্যভাবে তোমার দেহে শ্বেত চামর বীজন করিতেছে। তুমি পৃথিবীতলে পুষ্প, স্বর্গবাসিগণ

তোমার সুষমা দেখিতে স্বর্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, তপস্বিগণ তোমার বন্দনা গান করিয়া থাকেন—তোমার অক্ষয় কল্যাণ হৌক, অক্ষয় কল্যাণ হৌক।" এই বলিয়া উতঙ্ক আনন্দিত অন্তরে প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক ও প্রতিহারী চলিয়া গেলে, সখীর গলা ধরিয়া শুভশুক্লা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সখি আজ আমার বড় আনন্দ হইল! তুচ্ছ সোনার কুণ্ডল আজি পবিত্র হইল।"

সখী হাসিয়া বলিলেন "আমরাও তোমার আনন্দে আনন্দিত। কিন্তু সখি, পথে যে তক্ষক কোন বিপদ ঘটাইবে না এ ত আমার বোধ হয় না।"

শুভশুক্লা বলিলেন, "বিপদ ঘটিলেও ব্রহ্মচারীকে কে প্রতিহত করিবে? দেবতাগণ মিলিয়া ব্রহ্মচারীর কুণ্ডল উদ্ধার করিয়া দিবেন। কিন্তু সে কথা যাক্,—সখি, সৎপাত্রে দান করিলে কি রকম হয়, বল দেখি?"

সখী বলিলেন, "যে দান করিয়াছে, সেই দানের শান্তি বুঝিতে পারে—আমরা কি বুঝিব?"

লজ্জিত হইয়া রাণী বলিলেন, "সখি, তোমরা

আমাকে ভাল না বাসিলে, আমি কি দান করিতে পারিতাম ? তোমরা আমাকে হৃদয় দান করিয়াছ, সেই বলে আমি আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে পারি।”

তখন সখী হাসিয়া, কোন কথা না বলিয়া, সম্মুখের অর্ঘ্যথালা হইতে চন্দন লইয়া শুভশুক্লার কপালে একটি ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। শুভশুক্লাও নীরবে হাসিয়া সেইরূপ ভঙ্গিতে চন্দন লইয়া সখীর কপালে ফোঁটা পরাইলেন। দুই শঙ্খাসনে বসিয়া, দুই সখীতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

এদিকে উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে গৃহের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের কথা ভাবিতে লাগিলেন। শীঘ্রই পৌষ্যের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। পৌষ্য তখন সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া কতকগুলি ফুল লইয়া আসিতেছিলেন। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়াই ফুল মাটিতে ফেলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। পৌষ্য, তোমরা গৃহস্থ, তোমরাই সংসারকে পালন করিতেছ। তাই তোমরা প্রতিদিন সতীর কল্যাণ-

নির্ঝরধারায় স্নান করিতেছ। তোমাদের হৃদয় উদার—সর্ব্বজীবে তোমাদের দান। তোমার অক্ষয় কল্যাণ হৌক।”

পৌষ্য বলিলেন, “আপনার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিলাম। আপনি কি আজ রাত্রেই যাত্রা করিবেন? কাল প্রাতে গেলেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।” উতঙ্ক সে রাত্রে সেখানে বাস করিলেন।

সমস্ত জনমানব—পশুপক্ষীর কোলাহল নীরব হইয়া গেল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া, উতঙ্ক গৃহের মঙ্গল-শোভার কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই অনন্ত জ্যোৎস্নার উপর দিয়া, শত শত শুভ্রবেশধারী দেবতা সুমধুর বীণা বাজাইয়া নামিয়া আসিতেছে এবং গৃহের চারিদিকে দাঁড়াইয়া সুমধুর ছন্দের নানা মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তখন আবার উতঙ্কের সেই বৃষভের কথা মনে পড়িল। মা ঋষিপত্নীর স্নেহের কথা মনে পড়িল, ছাত্রগুলির কথা মনে পড়িল,—সে সমস্তই যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! সেই তপোবনে শৈশব হইতে কতশত ঘটনা ঘটিয়াছে—সব

উতঙ্কের মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে দুপ্রহর রাত্রির ঘণ্টা পড়িল। উতঙ্ক কুণ্ডল সাবধানে রক্ষা করিয়া, ইষ্টদেবের নাম জপিতে জপিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাঠের মধ্যে একটিও মানুষ কিম্বা গরু নাই। অত্যন্ত প্রখর রৌদ্র। কিন্তু সেই রৌদ্রের চোখে ধূলা উড়াইয়া প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে। দূরে চাহিয়া দেখ, বনের ডালপালাগুলা মাতিয়া যেন পাগল হাতীর মত এ ওর গায়ে শুঁড় মারিয়া বড় যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রবল নিশ্বাসের মত একটা সাঁ সাঁ শব্দ শুনা যাইতেছে। মাঠের উপরে ধূলিরাশি একদল পাগল ভূতের মত জড়ো হইয়া শাদা হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—কখনো বা ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা দীর্ঘ স্তম্ভের মত হইয়া উঠিতেছে। প্রবল

পাগল বায়ু সবেমাত্র ছুটিয়াছে, এখনো আকাশে তেমন মেঘ জমে নাই। কেবল ঐ গাছের নীচে নীচে আকাশের প্রান্তভাগ মলিন হইয়া রহিয়াছে। এই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া উপুড় হইয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে পাখীর ডানার মত উড়ন্ত উত্তরীয় লইয়া ওই কে অগ্রসর হইতেছে?—ওই আমাদের পরিচিত সেই উতঙ্ক। কুণ্ডল লইয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন।

উতঙ্ক মাঠ হইতে সরিয়া একটি গাছের আড়ালে আসিয়া বসিলেন। সাবধান, উতঙ্ক তোমার কুণ্ডল দুটি সাবধান করিয়া রাখ—এ সেই মাঠ যেখানে সেই অলৌকিক বৃষভ তোমাকে গোময় ভক্ষণ করাইয়াছিল—এখানে অলৌকিক ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, উতঙ্ক তাই ভাবিয়া সতর্ক হইয়া বসিলেন। ভাবিলেন, "দেখিব, কাল যে ব্যাপারটা দেখিলাম—তার অর্থ কি।"

অনেকক্ষণ ঐ ধূলা-ওড়া মাঠের দিকে উতঙ্ক চাহিয়া রহিলেন।—কিছুই না! কিন্তু পিছন ফিরিয়া বনের



আবার সেই নেংটি-পরা মুড়ামাথা মূর্ত্তি আকাশের উপরে ফুটিয়া উঠিল।

দিকে চাহিতেই উতঙ্ক আরেক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

দেখিলেন এক মাথামুড়ানো, নেংটি-পরা, কদাকার, দীর্ঘ ক্ষপণক মাটি হইতে দুই তিন হাত উঁচু শূন্যের উপর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার দাড়ি-গোঁপ-কামানো মুখ, গালের চামড়া গুলি শিথিল, কপালে ভীষণ কালো তিন চারিটি রেখা, বারবার মুখ বিকৃত করিয়া, নুইয়া পড়িয়া দুই পাশে শূন্যের উপর হাত চাপিতে চাপিতে ক্ষপণক অগ্রসর হইতেছে—বোধ হয় যেন ধূলি-উড়ান হাওয়াটার উপরে বিরক্ত হইয়া সেইটাকেই দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

উতঙ্ক ভাবিলেন 'একি কাণ্ড!' কিন্তু তখনি ক্ষপণক অদৃশ্য হইল। সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি এবং তাহার অদ্ভুত ছায়াবাজী দেখিয়া উতঙ্কের বড়ই হাসি পাইল। বিস্ময় বাড়িতে বাড়িতে আবার সেই নেংটি-পরা, মুড়ামাথা-মূর্ত্তি আকাশের উপরে ফুটিয়া উঠিল। উতঙ্ক নিমেষ ফেলিতেই আবার মূর্ত্তি অদৃশ্য।

উতঙ্ক আপনা আপনি হাসিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন

"এবারে ক্ষপণক ঠিক মাথার উপরে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি একবার দাঁড়াইয়া পড়ি—নেংটি-পরা বাজীকর মহাশয়কে এবার বন্দী করিতে হইবে।" হাসিতে হাসিতে এই কথা ভাবিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উতঙ্ক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায় ক্ষপণক, কোথায় কে? একটি বিদ্যুৎ-চমকানো কালের মধ্যে উতঙ্ক দেখিলেন তেজস্বী তক্ষক পাঁচ হাত দূরে শূন্যতল হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহার পদতলে পড়িল এবং পদতল হইতে কুণ্ডলের কৌটাটি লইয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

দুষ্ট তক্ষকের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া উতঙ্ক হঠাৎ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনি আবার মন স্থির করিয়া ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন "হে বজ্রধারী বলবান ইন্দ্র, তোমার বজ্র পাথর বিদীর্ণ করিতে পারে, পৃথিবী ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে—তোমার বজ্র অগ্নিময় নাগিনীবেষ্টিত এক দ্রুতগামী রথে চড়িয়া ভীষণ শব্দে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিয়া থাকে—তুমি এই দীন ব্রাহ্মণের সহায় হও।

"হে ইন্দ্র! তোমার মেঘ তাপিতকে ছায়া দান

করে, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করে, এবং প্রজাগণকে প্রচুর শস্য দান করিয়া থাকে,—তুমি এই ব্রহ্মচারীর সহায় হও।"

আকাশের দিকে চাহিয়া, জোড় হাত করিয়া উতঙ্ক এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন; অমনি আকাশের কোল হইতে, দেখিতে দেখিতে একখানি মেঘ উতঙ্কের ঠিক মাথার ঊর্দ্ধে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল পরেই উতঙ্ক দেখিতে পাইলেন, মেঘটির নীচে যেন একটি কোমল বর্ষা নামিয়াছে, একটি রামধনু ফুটিয়াছে, এদিক হইতে ওদিকে কখনো উজ্জ্বল বিজুলিছটা তক্ তক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—উতঙ্কের বোধ হইল যেন ঐ কালো মেঘের মধ্যে বসিয়া বারবার কে স্নেহে হাস্য করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিতেছে! উতঙ্ক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি করিয়া মেঘখানি নীচে নামিয়া আসিল। অবশেষে উতঙ্ককে জড়াইয়া লইয়া বিদ্যুতের আঘাতে মাটি ফাটাইয়া, মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকার ভিজা মেঘের মধ্যে রামধনুর বেষ্টনের মধ্যে বসিয়া উতঙ্ক রসাতলের দিকে

নামিয়া চলিলেন। পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করিতে করিতে কত সুগন্ধি গাছের শিকড়, কত বিচিত্র কীট, উতঙ্ক তাহার মেঘরথের চারিদিকে লম্বমান দেখিতে পাইলেন। মেঘের মধ্যে বসিয়া উতঙ্ক সুখকর শীতলতা অনুভব করিতে করিতে হঠাৎ একটা জায়গায় আসিয়া তল পাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রসাতল আর কিছুই নয়, রসাতল একটি মনোরম কবিকল্পনা। একটি গাছকে পোষণ করিতে বাহিরের বায়ু এবং আলো—এবং মাটির অন্ধকারের ভিতরে সুশীতল রসের দরকার—আর এই প্রকাণ্ড সৌরজগৎরূপ গাছটিকে পোষণ করিতে রসের প্রয়োজন হইবে না?—তেজের প্রয়োজন হইবে না? কবিগণ যখন ধ্যানের দ্বারা এই রসের আভাস পাইলেন, গ্রহ উপগ্রহে শোভিত

সৌরজগতের সৌন্দর্য্য, বিশালত্ব এবং তেজস্বিতার আধার ভাবটি যখন তাঁহাদের মনটিকে পূর্ণ করিল, তখন সেই তেজ এবং রসের আনন্দে তাঁহারা নানা বিচিত্র কল্পনা দ্বারা এই রসভাবটি প্রকাশ করিলেন, এই তেজের ক্রীড়া ব্যক্ত করিলেন।

রসাতলই সেই অতল রসের ভাণ্ডার যেখান হইতে রস টানিয়া এই সৌরজগৎ একটি গাছের মত বিকশিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছের যেমন শিকড় মাটির মধ্যে থাকে,—সেখানে মাটি তাহাকে প্রত্যহ রস পান করাইয়া পুষ্ট করে, তেমনি সৌরজগতের মূল রসাতলের মধ্যে গিয়া নামিয়াছে। এই জগতের উপরে আলোকে বিদ্যুতে বিকীর্ণ যে তেজ দেখিতেছ—সেও রসাতলের গোপন-কক্ষে আপনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং পৃথিবীর উপরে যে বৎসরের অংশে অংশে ঋতুর বিচিত্র ছবি দেখিতেছ, ইহাও সেইখানকার একটি মূল ছবিরই প্রতিবিম্ব, এবং পৃথিবীর নিত্য নূতন দিবা রাত্রিও সেখানকার একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলামাত্র। এই পৃথিবী, এই সূর্য্যমণ্ডল নানা ক্ষয়সত্ত্বেও যে প্রতিদিন

সজীব রহিয়াছে ঋষি-কবিগণ সেই সজীবতার মধ্যে যে ঐশী-শক্তি দেখিতে পাইতেন তাহাকেই বলিতেন দেবতা অশ্বিনীকুমার। জগতের স্বাস্থ্যের তরুণ দেবতা-যুগল অশ্বিনীকুমারও সেই রসাতলে তাঁহাদের তেজোময় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

বাস্তবিক রসাতলের ভাণ্ডারে জগৎ পোষণ করিবার জন্য নানা আশ্চর্য্য জিনিষ সঞ্চিত রহিয়াছে। তাই এই রসাতল ভয়ঙ্কর। এখানে কেহ যাইতে পারে না। ভীষণ নাগগণ চারিদিকে মহাতেজে শ্বসিয়া বেড়াইতেছে—পৃথিবীর এবং সমুদ্রের সমস্ত রত্নরাশিকে পাহারা দিয়া রাখিতেছে। রসাতলের উপরে কোথাও সর্ব্বদাই মেঘের মত মলিন আলো ঘনাইয়া আছে—মাঝে মাঝে নিঃশব্দে বিদ্যুত চমকিয়া উঠিতেছে; কোথাও কোথাও বা স্থির বিদ্যুৎ তীব্রসুন্দর আলো দান করিতেছে। এখানকার বায়ুও স্থির। আমাদের বায়ুর মত চঞ্চল নহে। সর্ব্বদাই অত্যন্ত শীতল ভাবে ধীরে ধীরে বহিতেছে। রসাতলের চারিদিক হইতে একত্রিত লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনির মত গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে।

এই রসাতলের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই উতঙ্ক সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন। উতঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

তোমরা বুঝিতে পার উতঙ্কের মনটি তখন কি একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকার, সেই গর্জ্জন শব্দ, তার উপরে আবার মনের ভয় এবং কষ্ট। অনেকক্ষণ কষ্টের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া, ব্রহ্মচারী তাঁহার ধীর মনটিকে একাগ্রতম করিয়া ইন্দ্রের ধ্যানে বসিলেন।

গভীর ধ্যানের শক্তি থাকিলেই দেবতাকে পাওয়া যায়; কারণ, দেবতার করুণা আমাদের চারিদিকে চিরকাল রহিয়াছে। উতঙ্ক ব্রহ্মচারী, গভীর ধ্যানের শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

উতঙ্ক যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন তখন একটা ভীষণ শব্দ হইয়া উতঙ্কের ডান দিকে কিছুদূরে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া যেন একটা অগ্নিশিখার আলো প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার কানে গম্ভীর শব্দে দৈববাণী হইল "উতঙ্ক এই কক্ষে প্রবেশ কর।"

উতঙ্ক উঠিয়াই সেই উজ্জ্বল সুন্দর আলোক-শিখাটিকে

দেখিতে পাইলেন, চমকিয়া উঠিলেন। তখনি তাঁর মন আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি কতদিন রাত্রিশেষের অন্ধকারের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির বন্দনা করিতে গিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ রসাতলের অন্ধকারে এই বিরাট অগ্নিশিখার আলোকে নিমেষে তাঁর প্রাণ যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

উতঙ্ক দীর্ঘচ্ছন্দে এক অগ্নিবন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন অগ্নিশিখা কোথাও নাই একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণময় দ্বার ঐরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে।

উতঙ্ক বড়ই লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন "হায়, সোনার দুয়ারটাকে অগ্নি ভাবিয়া বন্দনা করিলাম! কিন্তু আমার বন্দনা কখনো বৃথা হইবে না, নিশ্চয় এই কক্ষমধ্যে অগ্নিদেবের দেখা পাইব।" উতঙ্ক স্বর্ণময়-দ্বারে আঘাত করিলেন। ছুঁইবামাত্র একটা প্রবল বাতাস তুলিয়া দুয়ারটা খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিয়া উতঙ্ক এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

দেখিতে পাইলেন শুভ্র আলোকে পরিপূর্ণ একটি

প্রকাণ্ড ঘর—তাহার মাঝখানে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির মত তেজস্বী একটি ঘোড়া তাহার সুদৃঢ় সুন্দর তেজঃপূর্ণ ঘাড়টি তুলিয়া বড় বড় চক্ষু দুটি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘোড়ার কেশর ধরিয়া এক বলবান্ পুরুষ তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বিচিত্রবেশধারী ছয়টি পরম সুন্দর বালক মত্ত হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরণের কাপড় ছাড়িয়া একখানি নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেছে; কিছুদূরে স্বর্ণাসনে বসিয়া দুইটি পরমাসুন্দরী যুবতী, তাহাদেরি অঙ্গের গৌরবর্ণের মত উজ্জ্বল এবং তাহাদেরি চুলের মত কালো—এই দুই রঙের সূতা মিশাইয়া একটি তাঁতের উপরে নিমেষে নিমেষে এক একটি কাপড় বুনিয়া ঐ শিশুগুলির গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে—তাহারা হাসিয়া হাসিয়া এই কাপড়ই কুড়াইয়া লইয়া পরিতেছে। একপাশে দুইটি তরুণ তেজস্বী দেবতা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

উতঙ্ক আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্য হইয়া এ ছবি দেখিতে লাগিলেন। ঐ তরুণ দেবতা দুটিকে এমন বলবান বোধ

হইতে লাগিল যেন ঐ আগুনের মত তেজস্বী ঘোড়াটিকে তাহারা অনায়াসে দৌড়াইয়া আনিতে পারে। তাহাদের শরীর দুটি এমনি আলস্যশূন্য সোজাভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বাহুদুটি এমন সরল ভাবে রহিয়াছে, যে মনে হয় যেন এখনি উহারা লাফ দিয়া উঠিয়া কোন সিংহের ঘাড়ে গিয়া পড়িবে—অথচ মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে একটি মৃদুহাস্য হাসিয়া দেবতা দুটি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

উতঙ্ক, ঘোড়ার কাছে যে পুরুষটি দাঁড়াইয়া আছে তার দিকে চাহিলেন। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেই উতঙ্ক বুঝিতে পারিলেন, এই পুরুষই সেই যিনি বৃষে চড়িয়া মাঠের মধ্যে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। উতঙ্ক কিছু বলিতে না বলিতেই পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বৎস, এই অশ্বটিকে বাহিরে লইয়া যাও, ইহার নাসারন্ধ্রে এক ফুৎকার প্রদান কর, এখনি তোমার কুণ্ডল পাইবে।"

উতঙ্ক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত হইয়া ঘোড়াটিকে বাহিরে লইয়া গিয়া পুরুষের আদেশমত উহার নাসারন্ধ্রে

এক প্রবল ফুৎকার লাগাইয়া দিলেন। ফুঁ দিতেই অশ্বের সমস্ত শরীরের রোম দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রমে বোধ হইতে লাগিল যেন রোমশিখা হইতে আগুন বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই হাহা করিয়া আগুন ছুটিল। কোন শব্দ নাই—নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দ অগ্নি সমস্ত রসাতলে ছড়াইয়া পড়িল—রসাতল তপ্ত হইয়া উঠিল। উতঙ্কের গায়ে আগুন লাগিল না। উতঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এইবার আমার অগ্নি বন্দনা সফল হইল। হে তেজস্বী বৈশ্বানর তোমাকে নমস্কার, সুন্দর জাতবেদা তোমাকে নমস্কার! বলবান অগ্নি আমাদিগকে সোনার রথে চড়াইয়া জগতের মূলে লইয়া যাইবেন। অগ্নিদেব তোমার আসনই বুঝি এই নিগূঢ় রসাতলে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—হে মহান্ তোমাকে নমস্কার।" আনন্দে স্তব শেষ করিয়া সেই পলাশের মত রাঙা, নিঃশব্দ, বিস্তীর্ণ, কম্পমান অগ্নির আভায় উজ্জ্বল ললাট উচ্চ করিয়া উতঙ্ক সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভীষণ অগ্নির তাপে পাগল হইয়া তক্ষক ঘাড় লম্বা করিয়া তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া

আসিল,—সোনার ফুলের মত ঝলমল সেই স্থূল কুণ্ডলটি উতঙ্কের পায়ের কাছে ফেলিয়া তখনি আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মুহূর্তে সমস্ত আগুন গুটাইয়া আসিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উতঙ্ক পায়ের কাছ হইতে কুণ্ডল তুলিয়া লইয়া কি বলিতে যাইবে—সহসা কোথায় রসাতল, কোথায় কি? উতঙ্ক দেখিতে পাইল চারিদিকে নূতন প্রভাতের রৌদ্র পড়িয়াছে, পাতার শিশির এখনো শুকায় নাই, সম্মুখেই তাহার গুরুর আশ্রমের পাশের ছোট্ট নদীটি বহিয়া যাইতেছে, পাখীরা গোলমাল করিতেছে।

কতক্ষণ উতঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "উঃ বুঝিয়াছি!" তার পরে আনন্দে চোখ দুটি নিমীলিত প্রায় করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে চলিলেন।

চারিদিকে ব্রাহ্মণেরা বসিয়াছেন। প্রত্যেকের শরীর হইতে যেন তেজ নির্গত হইতেছে—মাঝখানে বেদ বসিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। ঋষিপত্নী সেখানে উপস্থিত হইতেই সকলে সম্ভ্রম দেখাইলেন।

ঋষিপত্নী উতঙ্কের বিলম্বের কথা উল্লেখ করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। "এইত সকলি প্রস্তুত, কিন্তু উতঙ্ক এখনো কেন দেরী করিতেছে? পথে কোন বিপদ ঘটিল কি?"

বেদ বলিলেন "কোন চিন্তা নাই, উতঙ্ক এখনি আসিয়া পড়িবে।" বলিতে বলিতেই গন্ধরাজ ফুলগাছটির আড়াল হইতে উতঙ্কের মাথাটি জাগিয়া উঠিল, গুরু এবং গুরুপত্নী দুজনারি চক্ষু উতঙ্কের চক্ষের সঙ্গে এক সময়ে মিলিল। সকলেই আনন্দিত। উতঙ্ক আসিয়া প্রথমে গুরু ও গুরুপত্নীর পায়ের কাছে কুণ্ডল রাখিয়া প্রণাম করিলেন, পরে আর সকলকে নমস্কার করিলেন। জননী আনন্দে চোখের জল ফেলিয়া, সতীর কুণ্ডল হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

গুরুর স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া উতঙ্ক আসিয়া সভার এক পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিতে লাগিলেন "গুরুদেব, আজ আমি বিশ্বের অতল রসের আভাস পাইয়াছি। আপনার কৃপায় আমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত

সার্থক হইয়াছে। ইন্দ্র আমাকে অমৃত পান করাইয়া গিয়াছেন—রসাতলে ডুবিয়া দিনরাত্রির সৌন্দর্য্য, ঋতুর চঞ্চল নৃত্য, জগতের অক্ষয় রূপ সকলেরই আমি আভাস পাইলাম। অগ্নির তেজ আমার ললাটকে স্পর্শ করিল, সমস্ত জগতের মধ্যে নিগূঢ় অগ্নির মহিমা আমার চিত্তকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করিয়াছে। ইন্দ্র আমার অন্তরের আসনে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। পৃথিবীতে আমার জীবন সার্থক হইবে। গুরুদেব আপনার পায়ে কোটি কোটি নমস্কার। আমি আর কি বলিব ? আপনার আশীর্ব্বাদ আমার চিরদিনের সহায় হউক।"

এই বলিয়া উতঙ্ক আসিয়া গুরুর পদতলে বসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী 'সাধু সাধু' বলিয়া উতঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। গুরু বেদ স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "বৎস, ব্রহ্মমন্ত্র তোমার হৃদয়ে চিরকাল নিবিষ্ট রহুক, তোমার চিত্তমন চিরকাল জগতের আনন্দরসে সিক্ত হইয়া প্রসন্ন হৌক, তোমার জীবন সংসারে সফল হইবে—তোমার হৃদয়ে মহত্ত্ব সর্ব্বদা প্রস্ফূর্ত্ত

হইবে। তোমার মত সমস্ত শিষ্যই যেন কৃতী হইতে পারে।"

উপসংহার

কল্যাণীয় শিষ্যগণ, এতক্ষণে আমাদের গল্প শেষ হইল। এই উতঙ্কের হৃদয়ে যে সর্ব্বদা মহত্ত্ব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? প্রার্থনা করি, তোমরাও ব্রহ্মচারী হইয়া বিশ্বের অতল রহস্য জানিতে পাও, সতীর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, গুরুর আশীর্ব্বাদকে চিরসঙ্গী করিয়া রাখ। উপসংহারে আমিও বেদের মত বলিতেছি "আমাদের আশীর্ব্বাদ মেঘে মিশিয়া বৃষ্টিরূপে তোমাদের মাথায় পড়ুক, সূর্য্যকিরণে মিলিয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমাদের চক্ষে

আসিয়া আবির্ভূত হৌক এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় শান্তি বহন করিয়া বায়ুর সহিত সঞ্চরিত হইতে থাকুক্ !

"তোমাদেরো হৃদয়ে ব্রহ্মমন্ত্র নিবিষ্ট হৌক। জগতের আনন্দরসে সিক্ত হইয়া চিত্তমন প্রসন্ন হৌক। সংসারে জীবন সফল হৌক—প্রাণে সর্ব্বদা মহত্ত্ব প্রস্ফূর্ত্ত হৌক। তোমরাও সকলে কৃতী হও, শক্তিমান হও, নির্ভয় হও, নির্ম্মল হও, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া আত্মাকে সার্থক কর।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।